রবীন্দ্রনাথের চোখে ‘নারী’

ডঃ হুমায়ুন আজাদ

পর্ব-৫

রবীন্দ্রনাথের মতো একজন স্পর্শকাতর, রোম্যানটিক কবি কী ক’রে এতো সংবেদনহীন হয়ে উঠতে পারেন, তা ভাবতেও শোক জাগে। তিনি স্তব করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে শোচনীয় মর্মান্তিক এক ব্যাপারের। হিন্দু বিধবা সব ধরনের বিধবার মধ্যে শোচনীয়তম, তার জীবন হচ্ছে ধারাবাহিক সতীদাহ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন ‘হৃদয়ের চরিতার্থতা’। যার জীবন সম্পূর্ণ শূন্য শুষ্ক পতিত অনুর্বর, তার জীবনকে কতকগুলো নিরর্থক শব্দে পূর্ণ ক’রে তোলার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

পূর্ববর্তী পর্বের পর .....

রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের নারীমুক্তি আন্দোলনকে মনে করেছেন সমাজের সামঞ্জস্যনাশের পরিণতি। যদি পশ্চিমি সভ্যতার কেন্দ্রানুগ-কেন্দ্রাতিগ শক্তি ঠিক মতো কাজ করতো, অর্থাৎ নারী থাকতো ঘরে আর পুরুষ থাকতো বাইরে, তাহলে, তাঁর বিশ্বাস, এমন নারীমুক্তির আন্দোলন দেখা দিতো না। ধ’রে নিতে পারি যে তখন যেহেতু ভারতে ইউরোপীয় ধরনের নারীমুক্তির আন্দোলন দেখা দেয় নি, তাই ভারতীয় সমাজের সামঞ্জস্য ছিলো অটুট; বা ভারতীয় পুরুষেরা সমাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করতো সে-উপায়ে যেভাবে তারা পুনায় থামিয়ে দিয়েছিলো নারীমুক্তিবাদী রমাবাইর বক্তৃতা! নারীমুক্তির ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> *য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারপ্রাপ্তির যে-চেষ্টা করছে সমাজের এই সামঞ্জস্যনাশই তার কারণ বলে বোধ হয়। নরোয়েদেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন-রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায়, নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে, অথচ পুরুষেরা সমাজপ্রথার অনুকূলে। এইরকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে আমার মনে হল, বাস্তবিক, বর্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসংগত।*

রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রস্তাব করেছেন এক ভয়ঙ্কর প্রগতিবিরোধী তত্ত্ব যে সমান অধিকার পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সমাজের সামঞ্জস্যনাশ। তাঁর কাছে অসাম্য হচ্ছে সামাজিক সামঞ্জস্য, আর সাম্যের অধিকার দাবি হচ্ছে সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট করা। তাঁর তত্ত্বানুসারে দরিদ্র সাম্য দাবি করতে পারবে না ধনীর সাথে, শোষিত সাম্য দাবি করতে পারবে না শোষকের সাথে, নারীও সাম্য দাবি করতে পারবে না পুরুষের সাথে; তাতে নষ্ট হয়ে যাবে সামাজিক সঙ্গীতের সুর, বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য। অসাম্যই যে সামঞ্জস্যহীনতা, বিভিন্ন ধরনের অসাম্যের জন্যেই যে মানবসমাজ আজো সামঞ্জস্যহীন, তাই অসাম্য দূর করেই যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রকৃত সামঞ্জস্য বা সৌন্দর্য, তা মনে পড়ে নি তাঁর। নারীমুক্তিবাদীরা চাইছিলো সমাজের বিশুদ্ধ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে, তা তিনি বোঝেন নি, কেননা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করছিলো প্রথা। তিনি ইবসেনের *পুতুলের খেলাঘর (১৮৭৯)* নাটকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তবে তিনি নোরা হেলমারের বিদ্রোহের প্রকৃতি

অনুভব করার মতো সংবেদনশীল ছিলেন না। ইবসেন নাটকটিতে সরলভাবে বলেছেন যে নারী মানুষ। নোরা, লৈঙ্গিক বিপ্লবের প্রথম নায়িকা, যা প্রকাশ করে তা 'অসহিষ্ণুতা' নয়, সে সূচনা করে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের। নোরা তার স্বামীকে বলে :

> *তুমি আমার প্রতি সবসময় সদয় ছিলে। তবে তোমার গৃহটি ছিলো খেলাঘর। আমি ছিলাম তোমার পুতুল বউ, যেমন আমাদের বাড়িতে আমি ছিলাম বাবার পুতুল মেয়ে; আর এখানে শিশুরা আমার পুতুল। তুমি আমাকে নিয়ে যখন খেলতে তখন আমার খুব মজা লাগতো, যেমন শিশুদের নিয়ে আমি যখন খেলাতাম তখন তারা খুব মজা পেতো। টোরভাল্ড, এই হচ্ছে আমাদের বিয়ে .....*
>
> *সন্তানদের মানুষ করার জন্যে আমি কিভাবে উপযুক্ত? তার আগে আমার আরেক কাজ আছে। আমি প্রথম শিক্ষা দেবো নিজেকে–তুমি আমাকে সহায়তা করার মতো মানুষ নও। আমার নিজেকেই তা করতে হবে। আর সে–জন্যেই আমি ছেড়ে যাচ্ছি তোমাকে..... নিজেকে আর আমার চারপাশের সবকিছু বোঝার জন্যে আমাকে দাঁড়াতে হবে সম্পূর্ণ একলা। সে–জন্যেই আমি আর তোমার সাথে আর থাকতে পারি না.....*

এমন কথায় সমগ্র পুরুষতন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ আহত বোধ করবেন, এবং আহত বোধ করে নোরার স্বামীও। খাঁটি পুরুষাধিত্যবাদী স্বামী হিশেবে সে নোরাকে বোঝায় স্বামী ও সন্তানের প্রতি নারীর রয়েছে 'পবিত্র দায়িত্ব'; সবার আগে নোরা হচ্ছে 'স্ত্রী ও মা'। কিন্তু নোরা মনে করে অন্যরকম :

> *আমার বিশ্বাস সবার আগে আমি একজন মানুষ, ঠিক তুমি যেমন; বা আমি চেষ্টা করবো একজন মানুষ হয়ে উঠতে। টোরভাল্ড, আমি জানি অধিকাংশ মানুষই মনে করবে যে তুমিই ঠিক, আর ওই ধরনের কথা পাওয়া যাবে বইপুস্তকে; তবে অধিকাংশ মানুষ কি বলে আর বইতে কি পাওয়া যায়, তা নিয়ে আমি খুশি থাকতে পারি না। নিজের জন্যে সবকিছু আমাকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে.....*

নোরা, ও পশ্চিমের নারীমুক্তিবাদীরা, নারীর জন্যে চেয়েছে মানুষের অধিকার; তারা অভিনয় করতে চায়নি পুরুষতন্ত্রের দেয়া স্ত্রী বা মায়ের পার্টে। এটা কোনো অসংগত ব্যাপার না হ'লেও রবীন্দ্রনাথের কাছে তা 'অসংগত'। বৈষম্য আর নারীর পুরুষাধীনতা সঙ্গত তাঁর কাছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ইউরোপের 'স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের স্ত্রীস্বভাবের জন্যে লজ্জিত'। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন 'স্ত্রীস্বভাব' ব'লে একটা কৃত্রিম বিকৃত জিনিশে, যা মিল বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন নারী-অধীনতায় (১৮৬৯)।

একদশক আগে প্রথমবার বিলেতে গিয়ে সেখানকার নারীদের স্বাধীনতা দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো যে ভারতীয়রা নিজেদের প্রয়োজনে নারীদের ক'রে তুলেছে 'জন্তু' আর 'জড়পদার্থ'। একদশকের মধ্যে তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন একজন আদর্শ ভারতীয়, যিনি নারীদের ক'রে রাখতে চান ওই জন্তু আর জড়পদার্থ, যিনি বিশ্বাস করেন না নারীমুক্তিতে, যিনি প্রচার করেন ভারতীয় নারীর সুখের রূপকথা :

আমরা তো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু-গাছি বালা প'রে সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্ন মুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের মধুর করে রেখেছেন। কখনো কখনো অভিমানের অশ্রুজলে তাঁদের নয়নপল্লব আর্দ্র হয়ে আসে, কখনো-বা ভালোবাসার গুরুতর অত্যাচারে তাঁদের সরল সুন্দর সুখশ্রী ধৈর্যগম্ভীর সকরুন বিষাদে ম্লানকান্তি ধারন করে;..... যা হোক, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা যে বড়ো অসুখে আছেন, এমনতরো আমাদের কাছে তা কখনো প্রকাশ করেন নি, মাঝের থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে লোকের অনর্থক হৃদয় বিদীর্ন হয়ে যায় কেন।

যে চোখে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এখানে ভারতীয় নারীদের, সে-চোখকে অন্ধ বললে ভুল বলা হয় না। তিনি নারীদের দেখেছেন পুরুষতন্ত্রের চোখে, আর রোম্যান্টিকের দৃষ্টিতে; তাঁর চোখে পড়েছে নারীর সুগোল কোমল বাহু, দু-গাছি বালা, স্নেহ প্রেম কল্যাণের মতো কল্পিত ব্যাপারগুলো। এ-বর্ণনা প'ড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বাস্তব নারীদের কখনো দেখেন নি, বা দেখেছেন সামন্ত-সচ্ছল পরিবারের অবাস্তব নারীদের, যাদের ছিলো সুগোল বাহু, এবং তা কোমলও, আর তাতে বালাও ছিলো; কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় নারীর রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতীয় নারীর দুর্দশা থেকে গেছে তাঁর চোখের আড়ালে। 'আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি', তাঁর এ-স্বীকারোক্তি হয়তো সত্য; তবে 'তাঁরা যে বড়ো অসুখে আছেন এমনতরো আমাদের কাছে তো কখনো প্রকাশ করেন নি', একথা সত্য নয়। নারীরা তাদের অসুখের কথা বলেছে বা জানিয়েছে বারবার, কিন্তু পুরুষতন্ত্র তাতে কান দেয় নি, বা তাদের স্তব্ধ ক'রে দিয়েছে যেমন স্তব্ধ ক'রেছে তারা রমাবাইকে। নারী যে অসুখী হ'তে পারে, তা-ই বিশ্বাস করতে পারে নি পুরুষাত্যবাদীরা। রবীন্দ্রনাথ তাদের একজন।

তিনি ঘোষনা করেছেন, 'আমাদের সমাজের যেরকম গঠন, তাতে সমাজের ভালোমন্দ যাই-হোক আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ রকম সুখে আছেন। ইংরেজরা মনে করতে পারেন লনটেনিস না খেললে এবং 'বল' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কার হতেও পারে।' একজন খাঁটি প্রথাবাদী ভারতীয় হিশেবে রবীন্দ্রনাথ জোর ক'রেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সুখে আছে ভারতীয় নারীরা। সুখ ব্যাপারটি খুবই মানসিক, সুখে থাকতে পারে রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য আর অসুখে থাকতে পারেন প্রভু রবীন্দ্রনাথ, তবে ভারতীয় নারীরা আসলে বেশ রকম সুখে ছিলো না। তিনি লনটেনিস খেলা বা বল নাচাকে নিন্দা করেছেন, তিনি মনে করেন ওগুলো নারীর সুখের জন্যে দরকার নয়; কিন্তু তিনি যদি ভারতীয় নারীদের কাছে জানতে চাইতেন এ-সম্পর্কে, তাহলে যে-উত্তর পেতেন তাতে ক্ষুব্ধ বোধ করতেন। দেখতেন খেলতে আর নাচতে চায় ভারতীয় নারীরাও! তিনি বিশ্বাস করেন, 'ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ।' তাঁর উপলব্ধি চমৎকার, তবে প্রশ্ন হচ্ছে পুরুষের সুখ কীসে; ভালো না বেসে, ভালোবাসা না পেয়ে? পুরুষের জন্যে কি ভালোবাসা কি নিরর্থক? পুরুষ কি এমন জন্তু, যার দরকার নেই ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাওয়ার? রবীন্দ্রনাথ নারীকে মনে করেছেন খেলার পুতুল, টোরভাল্ডের মতো তিনিও পছন্দ করেন পুতুল খেলতে; মনে করেন নারীর কাজ হচ্ছে পুরুষকে ভালোবাসা, আর কখনোকখনো পুরুষের আদর পাওয়া। পুরুষের এ-ভালোবাসা যে অপমান, তা বুঝেছিলো রবীন্দ্রনাথের 'নারী উক্তি'র নারীটি; সে জানিয়েছিলো, 'আছি যেন সোনার খাঁচায়/ একখানি পোষ-মানা প্রাণ।/ এও কি বুঝাতে হয়-/ প্রেম যদি নাহি রয়/ হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান।' ভারতীয় নারী হয়তো প্রাণভ'রে ভালোবেসেছে তাদের

পুরুষদের, কিন্তু তারা ভালোবাসা পায়নি, পেয়েছে সোহাগের নামে অপমান। তবে ওই সোহাগও জোটে নি অধিকাংশ নারীর ভাগ্যে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, 'আমাদের পরিবারে নারীহৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন ইংরেজ-পরিবারে অসম্ভব।' ইংরেজ পরিবারের তুলনায় হিন্দু/ব্রাহ্ম পরিবারে নারীহৃদয়ের বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভের যে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন, তা চূড়ান্তরূপে মর্মস্পর্শী। নারীর ধারাবাহিক লাঞ্ছনাকে তিনি বলেছেন নারীহৃদয়ের চরিতার্থতা। ভারতীয় নারীহৃদয়ের চরিতার্থতা প্রমাণের জন্যে তিনি তুলনা করেছেন ইংরেজ চিরকুমারী ও ভারতীয় বিধবার মধ্যে :

> *বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহুদুটি কখনো অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো জননী কখনো দুহিতা কখনো সখী। এই জন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল হয়ে থাকেন। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহুকালের সুখদুঃখময় প্রীতির সখিত্ববন্ধন, বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে স্নেহ-ভক্তি-পরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ; গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁর অভাব নেই। ..... বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদবৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।*

রবীন্দ্রনাথের মতো একজন স্পর্শকাতর, রোম্যানটিক কবি কী ক'রে এতো সংবেদনহীন হয়ে উঠতে পারেন, তা ভাবতেও শোক জাগে। তিনি স্তব করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে শোচনীয় মর্মান্তিক এক ব্যাপারের। হিন্দু বিধবা সব ধরনের বিধবার মধ্যে শোচনীয়তম, তার জীবন হচ্ছে ধারাবাহিক সতীদাহ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'হৃদয়ের চরিতার্থতা'। যার জীবন সম্পূর্ণ শূন্য শুষ্ক পতিত অনুর্বর, তার জীবনকে কতকগুলো নিরর্থক শব্দে পূর্ণ ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কি মনে করেন যে বিধবার জীবন ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু তার নারীপ্রকৃতি হয়ে উঠে বিচিত্রভাবে চরিতার্থ, কেননা তার আশ্রয়দাতা পরিবারটি তাকে এতো কাজ দেয় যে তাতেই সে ভ'রে উঠে? রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা বাস্তবভাবে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় যে বিধবার নিজের সন্তান না থাকলেও পরের সন্তান পালন করতে করতে কাটে তার সকাল থেকে সন্ধ্যা। পরের সন্তান পালন কী কঠিন কাজ, তা জানে শুধু বিধবারাই। 'তিনি কখনো জননী কখনো দুহিতা কখনো সখী';- এটা মধুর শুনালেও মধুর ব্যাপার নয়, খুবই বিষাক্ত ব্যাপার। এর বাস্তব অনুবাদ হচ্ছে বিধবা এমন মানুষ, যার নিজের কোনো সত্তা নেই, জীবন নেই, সে ঘোরে অন্যদের কেন্দ্র ক'রে; তার জীবন নিরবিচ্ছিন্ন লাঞ্ছনার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই মধুর। 'গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁর অভাব নেই', এর প্রথমাংশ সত্য না হ'লেও দ্বিতীয়াংশ খুবই সত্য যে বিধবা ক'রে থাকে দাসীর কাজ, আর তার কাজের কোনো শেষ নেই। ওই কাজের জন্যে সে পারিশ্রমিক পায় না, তার ভাগ্যে জোটে লাঞ্ছনা। 'একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে', কিন্তু তা থাকে না বিধবার; এর কারণ এ নয় যে তার হৃদয়পাত্র থেকে অমৃত উপচে পড়ছে, এসব তুচ্ছ কাজ করার মতো অবসর নেই। এর কারণ হচ্ছে দাসীর কোনো সুযোগ নেই ওই সব সামন্ত শখের। বিধবা হচ্ছে দন্ডিত নারী, যে কোনো অপরাধ করেনি; কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ নিরাপরাধ নারীর ওই দন্ডকেই মনে করেন হৃদয়ের চরিতার্থতা!

এ-সময়ে (১৮৯১) তিনি নারীমুক্তি সম্পর্কে স্বেচ্ছায় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন নারীমুক্তিবাদী কৃষ্ণভাবিনী দাসের সাথে। কৃষ্ণভাবিনী 'শিক্ষিত নারী' (১২৯৮) নামের একটি প্রবন্ধে দাবি করেন নারীশিক্ষা, চান কিছুটা স্বাধীনতা। নারীকে ঘরছাড়া করার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না, তিনিও চেয়েছিলেন শিক্ষার সাহায্যে উন্নতজাতের নারীউৎপাদন করতে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যগ্র হয়ে পড়েন নারীকে ঘরে আটকে রাখার জন্যে। তিনি নিজেকে দেখেন পুরুষতন্ত্রের মুখপাত্ররূপে, যাকে বাঁচানো তাঁর কাজ, যার মহিমা রক্ষা করা তাঁর দায়িত্ব। পুরুষই যে নারীকে আটকে রেখেছে ঘরে, কৃষ্ণভাবিনীর এ-অভিযোগ কাটানোর জন্য তিনি আবার দোহাই দেন প্রকৃতির [উদ্ধৃত, অনন্যা (১৩৯৪, ১৯)] :

> *প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্য্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন– পুরুষের সার্ব্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে– অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না।*

উনিশ শতকের বাঙালি নারীরা নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে দুটি রূপক ব্যবহার করেছেন বারবার : পিঞ্জর ও কারাগার। গৃহকে তারা দেখেছেন ওই রূপকে, তাঁরা দাবি করেছেন নারীকে সেখানে ঢুকিয়েছে পুরুষেরাই। কৃষ্ণভাবিনীও তা-ই বলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে মনে করেন প্রকৃতির শ্বাশত বিধান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস প্রকৃতিই বিকলাঙ্গ ক'রে তৈরি করেছে নারীকে, তাই থাকে থাকতে হবে ঘরে, মানতে হবে পুরুষাধিপত্য। ভিক্টোরীয়দের মতো রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নিজেকে উৎসর্গ করাই নারীত্ব। এ-সম্পর্কে কৃষ্ণভাবিনী যা বলেন, তা অবিস্মরণীয় [উদ্ধৃত, অনন্যা (১৩৯৪, ২০)] :

> *পরোপকার ও অন্যের জন্যে জীবন ধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।*

কৃষ্ণভাবিনীর উক্তির প্রথমাংশ উগ্র পুরুষতন্ত্রের সাথে আপোষ, আর দ্বিতীয়াংশ নিজেকে আবিষ্কার। নোরার মতো কৃষ্ণাবিনী শুধু নিজের জন্যে বাঁচতে চান নি, জীবণধারণ করতে চেয়েছেন প্রধানত পরেরই জন্যে, একটুকু শুধু বেঁচে থাকতে চেয়েছেন নিজের জন্যে। পুরুষতন্ত্র আর রবীন্দ্রনাথ তাতে রাজি নন; তিনি চান নারী হবে ক্রুশবিদ্ধ জিসাস, ত্যাগ স্বীকার ক'রে যাবে আমরণ। নারীর যে-স্তব করেন তিনি, তা পুরুষ করেছে বারবার নারীকে নিজের বশে রাখার জন্যে [উদ্ধৃত, অনন্যা (১৩৯৪, ২১)] :

> *নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ। তিনি পুরুষের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীত ঘটিতে পারে, তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সমাঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে।*

ভিক্টোরীয়রা নারীকে পুরুষের থেকে উৎকৃষ্ট ব'লে অবিরাম প্রশংসা করেছে, কিন্তু তাকে অধীনে রাখার সব রকম কৌশল নিয়েছে; 'উৎকৃষ্ট' কথাটি ছিলো এক নিরর্থক সুভাষণ। সে-নারীই ছিলো তাদের কাছে উৎকৃষ্ট, যে পুরুষের অধীনে থাকে। একে বিদ্রূপ ক'রে উনিশশতকের এক বিলেতি ব্যঙ্গচিত্রকর একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন, যাতে একটি পুরুষ চেয়ারে ব'সে তার স্ত্রীর দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে বলছে, 'হে নারী, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, মানবতার সম্রাজ্ঞী, মানবজাতির জননী, আমার জুতো খোলো' [দ্র ট্যানহিল (১৯৮০, চিত্র

১৯)]। মিল বলেছিলেন এটা এক পরিহাস যে উৎকৃষ্টরা থাকবে নিকৃষ্টদের অধীনে! 'নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ' এক শূন্য বুলি। রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই বিশ্বাস করেন ভিক্টোরীয় *ঘরেবাইরে* বা *ভিন্ন এলাকাতত্ত্বে*, এবং বিশেষধরণের নারীস্বভাবে। তিনি নারীকে মনে করেন প্রকৃতির হাতে তৈরি এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যাতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে যদি নারী চেষ্টা করে বাইরে আসার। ওই দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে যাবে নারীর স্বভাব-কোমলতা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা! নারীর অনেক আরোপিত স্বভাব যে পুরুষতন্ত্রেরই তৈরি, তা ভাবেন নি রবীন্দ্রনাথ।

নারী সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরিও বদ্ধমূল ক'রে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিশ-একুশ বছর বয়সে, যা তিনি পুষেছেন আশি বছর বয়স পর্যন্ত। নারীর দুটি বিপরীত ধ্রুবরূপে বিশ্বাস করেছেন তিনি : প্রিয়া ও জননী, উর্বশী ও কল্যাণী, বা পতিতা ও গৃহিণী। প্রিয়া-উর্বশী-পতিতা নারীর একরূপ, জননী-কল্যাণী-গৃহিণী আরেক রূপ। প্রথম রূপটির স্বপ্ন দেখেছেন তিনি কবিতার জন্য, দ্বিতীয় রূপটিকে তিনি চেয়েছেন বাস্তবে। তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাসে এ-রূপ দুটি ফিরেফিরে এসেছে। এ-রূপ দুটি তিনি পেয়েছেন হিন্দুপুরাণের সমুদ্রমন্থণ উপ্যাখানে, এবং এদের মনে করেছেন শ্বাশত, চিরন্তন। নারীকে তিনি স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত, অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর দেখতে চান নি। তাঁর কয়েকটি কবিতা প'ড়ে দেখতে পাই তিনি নারীকে দেখেছেন কী রূপে, আর কোন রূপ চেয়েছেন স্বপ্নে ও বাস্তবে। 'উর্বশী' [১৩০২, চিত্রা] কবিতাটিতে পাওয়া যায় নারীর এক রূপ, যে 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু', সে 'সুন্দরী রূপসী'। তার জন্ম হয়েছিলো 'মন্থিত সাগরে'। সে সৌন্দর্য, কিন্তু সে 'বৃন্তহীন পুষ্প', তার জীবন ট্র্যাজিক বেদনাপূর্ণ, কেননা সে কল্যাণী নয়। নারীর ওই রূপের জন্যে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে পারেন, কিন্তু তাকে গৃহে কামনা করেন না। *বলাকার* (১৩২১) ২৩-সংখ্যক কবিতায়ও মেলে নারীর দুই রূপ :

> কোন ক্ষণে
> সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
> উঠেছিলো দুই নারী
> অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
> একজন উর্বশী, সুন্দরী,
> বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
> স্বর্গের অপ্সরী।
> অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
> বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
> স্বর্গের ঈশ্বরী।

রবীন্দ্রচিন্তায় এ-দু-নারী আদিম, চিরন্তনী, শাশ্বতী; এদের পরিবর্তন নেই, এরা রবীন্দ্রনাথ ও পুরুষতন্ত্রের দুই নারী-স্টেরিওটাইপ। তাই নারী চিরকালই থেকে যাবে পৌরাণিক উর্বশী, যে কামনার তৃপ্তি যোগাবে পুরুষের, আর কল্যানী, যে পুরুষের গৃহকে ক'রে তুলবে স্বর্গের মতো সুখকর। এরা পরস্পরের বিপরীত : উর্বশী রূপসী, সে বেশ্যা, তাকে দেবদানব আর পুরুষ কেউ গ্রহন করে নি; আর কল্যানীকে পুরুষ বন্দী করেছে নিজের গৃহে। নারীর দু-রূপকে পুরুষ ও রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখেছেন, তাতে নারী হয়ে উঠেছে এক শোচনীয় প্রাণী : যাকে গৃহে গ্রহণ করা হয় নি, সে হয়েছে বেশ্যা-তার কাজ সকলের চিত্ত ও শরীরবিনোদন; আর যাকে গ্রহণ করা হয়েছে, সে হয়েছে দাসী। নারীর এ-দু-রূপই কাজ করেছে তাঁর কবিতার প্রেরণারূপে, সম্ভবত উর্বশী রূপটিই তাঁকে বেশি প্রেরণা দিয়েছে, তবে তিনি স্তব করেছেন নারীর

কল্যাণী বা দাসী রূপটির। কল্যাণীর ভবণখানি, রবীন্দ্রনাথের 'কল্যানী' [১৩০৭, *ক্ষণিকা*] কবিতার পরিকল্পনা অনুসারে, পুষ্পকান-মাঝে সাধারণত থাকে না, তবে এ কথা ঠিক যে 'কল্যাণী, নিত্য আছ আপন গৃহকাজে।' ভিক্টোরীয়দের '*অ্যাঞ্জেল ইন দি হাউস* ' আর রবীন্দ্রনাথের 'কল্যানী' দেবী, তাই ভাবতেই বিবমিষা ধরে যে দেবী সারক্ষণ করেছে গৃহকাজ, অর্থাৎ দাসীবৃত্তি; পুরুষ দেবীকে ক'রে তুলছে গৃহপরিচারিকা! এ-দাসীর নামে তিনি 'সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ' গানটি উৎসর্গ করেছেন, তাকে উপাধি দিয়েছেন 'স্বর্গের ঈশ্বরী', এবং তাকে করেছেন পার্থিব নারীর অনুসরণীয় আদর্শ : 'রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা,/ বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা'। রূপসীরা ওই দাসীকে পুজো করে, বিদুষীরা তাকে অভিনন্দিত করে! অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সার কথা হচ্ছে নারীর রূপের মূল্য নেই, জ্ঞানের মূল্য নেই আরো, নারীর মহিমা তার গৃহকাজে বা দাসীত্বে; এবং তাকে বন্দী ক'রে রাখতে হবে গৃহে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নারীকে হ'তে হবে নারী; আর পুরুষ হবে কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, শাসক প্রভৃতি, অর্থাৎ প্রভু বা স্রষ্টা। পুরুষতন্ত্র যে-ছকে তৈরি করেছে ও দেখতে চায় নারীকে, তিনি নারীকে দেখেন সেই-ছক অনুসারেই; নারী যখন ছক ভেঙ্গে ফেলে, তখন দেখা দেয় বিপর্যয়। এমনকি তিনি নিজেও যখন ছক ভেঙ্গে নারীকে ব্যক্তি ক'রে তোলেন, তখন অবিলম্বে তাকে পুনর্বিন্যস্ত করেন ছকের মধ্যে। 'সাধারণ মেয়ে' [১৩৩৯, পুনশ্চ] কবিতাটিতে মেলে এর পরিচয়। মালতী এ-কবিতায় নিতে চেয়েছে মহৎ প্রতিশোধ। দেবযানীর মতো অভিশাপ দেয়ার সুযোগ সে পায় নি, তাই সে গণিতে হ'তে চেয়েছে প্রথম, বিলেতে গিয়ে সম্ভবত করতে চেয়েছে ডক্টরেট। নরেশ যদি তাকে বিয়ে করতো, তবে সে ঢাকাই শাড়ি প'রে কপালে সিঁদুর মেখে হয়ে উঠতো প্রথাগত কল্যাণী-তার নাম হতো শ্রীমতি মালতী দাসী; তবে ব্যর্থতা যেমন অনেক মহৎ কাজের প্রেরণা, মালতী প্রেমের ব্যর্থতাও মালতীকে অনুপ্রাণিত করে মহৎ প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখতে। মালতী ছক ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে; প্রতারিত প্রেমিকা দিবাস্বপ্নে হয়ে উঠে মেধাবী ছাত্রী;-সাহিত্যের নয়, গণিতের। সে বিলেতে যায়, তার কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে পড়ে চারপাশ। তবে মালতী ছক ভাঙ্গতে-না-ভাঙ্গতেই রবীন্দ্রনাথ তাকে ফিরিয়ে আনেন পুরুষতন্ত্রের চিরন্তন ছকের মধ্যে :

> *মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।*
> *সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,*
> *যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,*
> *দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।*
> *জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে–*
> *শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লেও;*
> *ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে*
> *ধরা পড়ুক তার রহস্য–*

যদি নারীত্বই হয় তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তাহলে গণিতে প্রথম শ্রেণী আর বিলেতে গবেষণা হয়ে উঠে শোচনীয় পন্ডশ্রম। মালতী এতো কিছু ক'রেও অর্জন করে নি কোনো সাফল্যই, তার পরম সাফল্য পরনে ঢাকাই শাড়ি আর কপালে সিঁদুর! জ্ঞানী, বিদ্বান, বীর, কবি, শিল্পী, রাজারা ওর মাঝে আবিষ্কার করবে এক-ছক বাঁধা নারীকে, আর বিদুষী মালতী, রবীন্দ্রনাথের 'কল্যাণী' কবিতা অনুসারে, বরণমালা পরাবে কল্যানী বা দাসীর কণ্ঠে। এ-ছকের মধ্যেই নারীকে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমনকি তাঁর বিদ্রোহী নারী, যা উদ্ধত প্রশ্ন করে : 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেন নাহি দিবে অধিকার / হে বিধাতা?', যে ঘোষনা করে, 'যাব না বাসরকক্ষে বধুবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী', সেও ছকের মধ্যেই থেকে বলে : 'যাহা মোর অনির্বচনীয় /

তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয়' [*'সবলা' (১৩৩৫): মহুয়া*]। ওই অনির্বচনীয়টুকু হচ্ছে নারীত্ব, যা পুরুষতন্ত্রের অত্যন্ত প্রিয়।

[চলবে]

অনুলিখন : অনন্ত